কথামালা: একটি একুশ শতকীয় পাঠ ও মূল্যায়ন

সারসংক্ষেপ

১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর (১২ আশ্বিন, ১২২৭ সন) পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মেছিলেন পরবর্তীর বাংলার পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম তাঁর বাল্য ও কৈশোরকে খুব রাঙিয়ে দিতে পারেনি। গ্রামের পাঠশালায় পড়াশোনাশেষে আট বছর বয়েসে বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। শুরু হয়ে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়। আজন্ম মেধাবী ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে কৃতিত্বের পর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ব্যাকরণ, ইংরেজি, সাহিত্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি— প্রতিটি ধাপ উত্তীর্ণ হন। স্মৃতিশ্রেণিতে অভাবনীয় পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত হন। সাম্মানিক পান ৮০ টাকা। এহেন একটি মানুষ চাইলে রাজতোষ লাভ করে সুখে-আসঙ্গে আমরণ জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁর ধাত নয়। সোনার চামচমুখে তাঁর জন্ম ও জন্মপর অতিবাহন হয়নি বলেই সমাজকে খুব ভিতর থেকে চিনেছিলেন তিনি। সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত হয়েও সমাজকে সংস্কারের ঊর্ধ্বের কিছু মনে করেননি। সমাজ নদীর মতো— বয়ে চলে। একটি সুপ্রাচীন সমাজের সমস্ত রীতি, প্রথা, ধর্মপালনপদ্ধতিই ত্রুটিহীন হতে পারে না। কালের নিয়মেই তাতে বেনোজল মেশে। তিনি দেখেছেন এ'দেশের হিন্দু ঘরের (বিশেষত কুলীন ঘরের) বিধবাদের করুণাকর দশা। তিনি দেখেছেন কুলীনের কুলরক্ষার নামে বহুবিবাহ নামক বিষবৃক্ষটিতে কী মারাত্মক ফল ধরে আছে। সম্মুখলড়াইতে নেমে এর অপসামাজিক শিকড়গুলি এত সহজে উপড়ে ফেলা যাবে না। প্রথমেই সমাজকে শিক্ষিত করতে হবে, তারপর সমাজকে সংস্কৃত করতে হবে। শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কারকাজ— এই দু'টিকে সমান্তরালে না চালানো গেলে হিন্দু সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার এখন আর পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। নতুন দিনের সূর্যালোক ইউরোপ থেকে লাভ করা ছাড়া দ্বিতীয় বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। ইংরেজি শিক্ষার হাত ধরেই নবজাগরণের বাতাস বইয়ে

লেখক

ড. স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বিক্রমজিৎ গোস্বামী মেমোরিয়াল কলেজ,
জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
informtosnigdho@gmail.com

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

নিতে হবে। রেনেসাঁর জাদুস্পর্শে জেগে উঠবে নিয়মের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যাওয়া হিন্দু সমাজ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত ধরে যে শিক্ষার (ইংরেজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও) সূত্রপাত ঘটেছিল, পরে তার ব্যাটন উঠে এসেছে হিন্দু কলেজের হাতে। খ্রিস্টধর্মের প্রবল বন্যায় হিন্দুধর্ম যাতে ভেসে না যায়, তাঁকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়েছে। আবার আধুনিকতার আগুনে পুড়ে হিন্দুধর্ম যেন খাঁটি সোনা হয়ে খ্রিস্টধর্মের সামনে তুল্যমূল্য মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, লক্ষ্য রাখতে হয়েছে সেই দিকেও। জীবনকে উন্নত করে ধর্ম, ধর্মকে উন্নত করে শিক্ষা। বিদ্যাসাগর একদিকে *বর্ণপরিচয়* লিখে বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন, অন্যদিকে *আখ্যানমঞ্জরী*, *কথামালা* লিখে তার মধ্যে সঞ্চার করেছেন নৈতিক শিক্ষা। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহবিষয়ক বিতর্ক-পুস্তিকা লিখছেন, আবার জন ক্লার্ক মার্শম্যান-এর *History of Bengal বাঙ্গালার ইতিহাস* নামে অনুবাদ করে বাঙালিকে ইতিহাস সচেতন করে তুলতে চাইছেন। হিন্দি থেকে অনুবাদ করছেন, সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করছেন, ইংরেজি থেকে অনুবাদ করছেন অবক্ষয়কালে অন্ধ বাঙালিকে জ্যোৎস্নার সংক্রম দেবেন বলে। বাংলা ভাষাকে গুছিয়ে নিয়ে তবেই কলমকে তরবারি করতে পেরেছিলেন তিনি। তাই তাঁর মৌলিক রচনা সংখ্যায় কম। ভাষা গোছাতে গিয়ে সাহিত্যকে ততটা গুছিয়ে তোলা হয়নি তাঁর। আমার এই প্রবন্ধ *কথামালা* কী ও কেন, আজকের দিনে *কথামালা*-র প্রাসঙ্গিকতাই বা কী— তা নিয়ে সামান্য এক আলাপচার।

সূচক শব্দ : উনিশ শতকের বাংলা, নবজাগরণ ও আধুনিকতা, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা, নীতিশিক্ষা।

মূল প্রবন্ধ

উনিশ শতকের প্রথম পর্বের বাংলায় রেনেসাঁর যুগলক্ষণকে যাঁরা চেতনায় ধারণ করেছিলেন, তার প্রধানতম নামগুলির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম। মেদিনীপুরের আকাশ থেকে সাঁওতাল পরগনার অস্তাচল অবধি তাঁর বিস্তার প্রকৃতই সূর্যস্বরূপ। ছায়ায়, মায়ায়, মুখাঘাসে, সূর্যাতপে বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে নির্মাণ করেছিলেন তিনি। মধুসূদন দত্ত তাঁর প্রিয় 'Vid'-কে চিনেছিলেন এ'ভাবে: "The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of Bengali mother."[১] -ইংরেজজনোচিত প্রতাপ ও বাঙালি মায়ের নম্রতার বিরল এই মিশেলই তাঁকে এক ও অনন্য করেছে। তিনি একইসঙ্গে দৃঢ় ও কমনীয়, সুগত ও সংহত, যুক্ত ও বিবিক্ত।

বাঙালির সৌভাগ্য এই যে, সে একজন বিদ্যাসাগরকে পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি সময়ের সাহচর্য পাননি। তাঁকে সময় তৈরি করে নিতে হয়েছে। কালের খাত কেটেই কালের বয়া টেনে যেতে হয়েছে তাঁকে। ফলত জাতিগঠনের কাজেই তাঁর প্রতিভা স্ফূরিত ও অপচয়িত হয়েছে। জাতি শব্দটি অনেকান্ত। ভাষা, শিক্ষা, রুচি, অভ্যেস ইত্যাদি অনেককিছুই তার মধ্যে পড়ে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০ খ্রিঃ) ও বাংলার মধ্যযুগের শেষ একটি অঘোষিত সত্য। মঙ্গলকাব্যের আমল চলে গেছে। সাহিত্যের আজকের বাহন অবধারিতভাবে গদ্য। মধ্যযুগ বিদায় নিয়েছে অথচ সদর্থে (বা সর্বার্থে) আধুনিকতা তখনও আসেনি, এমত পটভূমিকায় বিদ্যাসাগর শিল্পীর নয়— মিস্ত্রির কাজ করেছেন কিংবা করতে বাধ্য হয়েছেন। হিন্দু কলেজের অতিনব্যদের মনে মাতৃভাষা ও সমাজ সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলে প্রকৃত শিক্ষিত বাঙালি পাঠকশ্রেণি তৈরি করা থেকে শুরু করে তাদের পাঠাভ্যাস, তাদের গদ্যরুচিকেও সঠিক হাতে চালনা করতে হয়েছে তাঁকে। ভাষা সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুললেই হয় না, নিয়ত তাদের রুচির জোগান দেওয়া চাই। মাতৃভাষা ভিন্ন একজন অধ্যয়কের হৃদয়ের আনন্দ ও মস্তিষ্কের আরাম হতে পারে না। এদেশের নারীমুক্তিরও অন্যতম পথিকৃৎ তিনি। তিনি বুঝেছিলেন নারী মুক্ত না হলে সমাজের মুক্তি অসম্ভব। তাই নারীশিক্ষার বিস্তারের জন্য অসংখ্য বিদ্যালয় ব্যক্তিগত ও সরকারি বদান্যতায় স্থাপন করেছিলেন। তিনি আরও বুঝেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা হল আবশ্যক শিক্ষা, তা সকলের জন্য। সেখানে মাতৃভাষায় পাঠদান প্রয়োজন, প্রয়োজন বাংলা ভাষায় রচিত পাঠ-পুস্তক। একদিকে বাঙালি জাতি, অন্যদিকে বাংলা ভাষা— যুগের সাপেক্ষে এই যুগলমূর্তির সম্পাদনাদায়িত্ব বিদ্যাসাগরকে নিতে হয়েছে। দায়িত্বপালনে তিনি বাধ্য ছিলেন না অবশ্যই, কিন্তু এই আন্তরিক তাগিদ আর অবাধ্য আগুনেই তো তিনি বিদ্যাসাগর। "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—…"[২]— রবীন্দ্রনাথ-এর এই উক্তিতে ভক্তির বাহুল্য নেই। বরং বাংলা ভাষার জায়গায় বাঙালি জাতি কথাটিও প্রযুক্ত হতেই পারত।

রবীন্দ্রনাথের সামনে কাহিনিকাব্য ও নাট্যশাখায় অন্তত মধুসূদন ছিলেন, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, গীতিকবিতায় ছিলেন একজন বিহারীলাল। তাই তাঁর প্রতিভা দৈব ও দানবীয় হওয়া সত্ত্বেও এ'কথা অনস্বীকার্য যে, তিনি সময়কে তাঁর অনুকূলে পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর পাননি। বিদ্যাসাগরের সামনে এমন

কেউ ছিলেন না, যাঁকে তিনি আদর্শ করতে পারেন। রামমোহনীয় গদ্য অথবা তারও আগে ফোর্ট উইলিয়াম-এর গদ্যের অনুসৃতি তাঁতে বর্তায়নি। বর্তানোর কথাও না, কারণ বাংলা গদ্য তার সম্যক চরিত্র নিয়ে সেখানে চিত্রিত হয়নি। কেবল ঐতিহাসিক কারণেই তার গুরুত্ব রয়েছে। তা আমাদের পিপাসা কিংবা মন-কেমনের সঙ্গী হতে পারেনি, পারেনি দাঢ়্যের হাতিয়ার হতে। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সেই পদবিন্যাসরীতি (SOV অর্থাৎ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াসম্বলিত বাগ্রীতি)-টি আবিষ্কার করলেন যা রম্যগুণান্বিত, যা সকলরকম ভাবপ্রকাশে সক্ষম। বাংলা ভাষাকে মোচড় দিয়ে তার শব্দভাণ্ডারকে সম্ভাবনাময় করে তুললেন তিনি। বিরামচিহ্নের সার্থক ব্যবহার করে বাংলা গদ্যকে দিলেন শ্রুতিসৌকর্য। অপিচ, তাঁর সাহিত্য কৃত্য হল কেবল, কীর্তি হল না কেবল একটিই কারণে— তিনি সময়কে সঙ্গে পেলেন না। তাঁকে সময় সৃষ্টি করতে হল। তাঁর পাণ্ডিত্যও মুখ্যত সীমায়িত হয়ে রইল ভাবানুবাদে— আহৃত বিষয়ের পরিবেশনায়। জাতিসংগঠনের আবশ্যিকতায়, তাঁর, সাহিত্যের মৌলখেত তৈরির ক্ষমতা বিনষ্ট হল। সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর নিহত হলেন সামাজিক বিদ্যাসাগরের হাতে। *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*-র সিংহভাগ দখল করে রইল এক পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা ও সামাজিক আন্দোলনকারী একটি মানুষের সংস্কারমূলক উদ্দেশ্যসিদ্ধির রচনা।

জাতির উন্নতির প্রাথমিক শর্ত নৈতিকতা। ন্যায়, নীতি ও নৈতিকতা মানবচরিত্রের বনিয়াদ। তাঁর অনুবাদের একটা বড় অংশ জুড়ে অবস্থান করছেন নীতিবেত্তা বিদ্যাসাগর। বীজজন্মেই জাতি শুদ্ধ হোক তিনি চেয়েছেন। এ তাঁর আদ্যন্ত সচেতন চাওয়া। কারণ বীজে যার শুদ্ধি, বৃক্ষে তারই মুক্তি। *আখ্যানমঞ্জরী*, *কথামালা*, *নীতিবোধ* এই গোত্রের লেখা। *চরিতাবলী*, *জীবনচরিত* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি এমন কয়েকটি জীবনকথা শুনিয়েছেন, যা মহাজীবনের দ্যোতনা দেয়।

১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের *কথামালা* বইটি প্রকাশ পেয়েছিল। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা নামে তার যে বিজ্ঞাপন তিনি লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ- "রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীসদেশে ঈশপ্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি, কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্পের রচনা করিয়া, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্প ইঙ্গরেজি প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, এবং য়ুরোপের সর্ব্বপ্রদেশেই, অদ্যাপি, আদরপূর্ব্বক, পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর; পাঠ করিলে, বিলক্ষণ কৌতূক জন্মে, এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়। এই নিমিত্ত, শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উইলিয়াম গর্ডন ইয়ঙ্ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে, আমি ঐ সকল গল্পের অনুবাদ প্রবৃত্ত হই।..."[৩]- তবু যে-গল্পগুলির বিষয়বস্তু এদেশীয় মাপবোধ ও জীবনধারার সঙ্গে যায়, শুধু সেইগুলিকেই তিনি নির্বাচন করেছিলেন। ধীসম্মত এই বিচার। *কথামালা*-র প্রথম সংস্করণে এমন আটষট্টি (৬৮)-টি গল্প ছিল। সাঁইত্রিশ (৩৭)-তম সংস্করণে আরও ছ'টি (৬টি) গল্প যুক্ত হয়ে মোট গল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় চুয়াত্তর (৭৪)। অধুনা এটিই এর মান্য সংস্করণ।

কথামালা-র গল্পগুলিতে মানুষ ও না-মানুষরা অনেকেই ভিড় করে আছে। মানুষের মধ্যেও যেমন রয়েছে নানান কিসিম; না-মানুষরাও এসেছে প্রাণি, পাখি, পতঙ্গের রূপে। অশ্বপাল, কৃষক, রাখাল, পথিক, রোগী, চিকিৎসক, গৃহস্থ, অশ্বারোহী, শিকারী, শাকুনিক, কৃপণ, ব্যবসায়ী, জ্যোতির্বেত্তা, কাঠুরিয়া,

মৎস্যজীবী, চোর, গোযানচালক, বৃদ্ধ, বিধবা ইত্যাদি অসংখ্য শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের মানুষের গল্প এখানে রয়েছে, রয়েছে জলদেবতা, যম প্রভৃতি মিথমূর্তি; দ্রাক্ষালতা, বটগাছেদের কথা। *কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল, ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর, শিকারী কুকুর, কুক্কুরদষ্ট মানুষ, কুকুর ও অশ্বগণ, কুকুর ও প্রতিবিম্ব, খরগোস ও শিকারী কুকুর, চোর ও কুকুর* গল্পের কুকুর, *বাঘ ও বক, ব্যাঘ্র ও মেষশাবক, ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর, রাখাল ও ব্যাঘ্র, নেকড়ে বাঘ ও মেষের পাল, নেকড়ে বাঘ ও মেষ, বাঘ ও ছাগল, সিংহ ও নেকড়ে বাঘ, মেষশাবক ও নেকড়ে বাঘ* গল্পের বাঘ, *কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল, শৃগাল ও কৃষক, সিংহ, গর্দ্দভ ও শৃগালের শিকার, লাঙ্গুলবিহীন শৃগাল, সিংহ, শৃগাল ও গর্দ্দভ, সিংহ, ভালুক ও শৃগাল, শৃগাল ও সারস, কাক ও শৃগাল, শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল, ভল্লুক ও শৃগাল, শৃগাল ও কণ্টকবৃক্ষ, সিংহ ও শৃগাল, ঈগল ও শৃগালী, পীড়িত সিংহ* গল্পের শৃগাল, *সিংহ ও ইঁদুর, সিংহ, গর্দ্দভ ও শৃগালের শিকার, সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার, সিংহ ও মহিষ, সিংহ, শৃগাল ও গর্দভ, সিংহ, ভালুক ও শৃগাল, পীড়িত সিংহ, সিংহ ও তিন বৃষ, সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দভ, গর্দ্দভ, কুক্কুট ও সিংহ, সিংহ ও নেকড়ে বাঘ, বৃদ্ধ সিংহ, সিংহ ও কৃষক, সিংহ ও শৃগাল* গল্পের সিংহ, *বাঘ ও বক* গল্পের বক, *কৃষক ও সারস, সারসী ও তাহার শিশু সন্তান, শৃগাল ও সারস* গল্পের সারস, *খরগোস ও কচ্ছপ, খরগোস ও শিকারী কুকুর, শশকগণ ও ভেকগণ* গল্পের খরগোস, *খরগোস ও কচ্ছপ, কচ্ছপ ও ঈগল পক্ষী* গল্পের কচ্ছপ, *শশকগণ ও ভেকগণ, বালকগণ ও ভেকসমূহ* গল্পের ভেক, *ব্যাঘ্র ও মেষশাবক, নেকড়ে বাঘ ও মেষের পাল, নেকড়ে বাঘ ও মেষ, মেষপালক ও নেকড়ে বাঘ* গল্পের মেষ, *সিংহ ও ইঁদুর, ইঁদুরের পরামর্শ* গল্পের ইঁদুর, *দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ, কাক ও জলের কলসী, ঈগল ও দাঁড়কাক, কাক ও শৃগাল* গল্পের কাক, *একচক্ষু হরিণ, হরিণ ও দ্রাক্ষালতা, হরিণ* গল্পের হরিণ ছাড়াও কুক্কুট, ময়ূর, অশ্ব (ঘোটক), সর্প, মাছি, অশ্ব, বৃষ, মহিষ, ভালুক (ভল্লুক), মশক, গর্দ্দভ, বলদ, পিপীলিকা, তৃণকীট, পারাবত (পায়রা), চিল, ঈগল ইত্যাদি অজস্র প্রাণ গল্পগুলির প্রাণভ্রমর হয়েছে।

পণ্ডিত ঈশপ নীতিগল্প লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেই আদল অক্ষুণ্ণ রেখেই তার বাংলায়ন করেছেন। নব্য জায়মান একটি জাতির জন্য গল্পের চাইতেও নীতিশিক্ষা যে বেশি জরুরি এ'কথা নিশ্চিত তিনি বুঝেছিলেন। নিজের জীবনাচরণ দিয়েও আজীবন তাই প্রখর মেধা, নির্ভীক সততা ও উন্নত মেরুদণ্ডের চর্চা করে গেছেন। *কথামালা*-র নীতিকথক বিদ্যাসাগর আর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বা বর্ণপরিচয়লেখক কিংবা বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকারী অথবা বহুবিবাহ রদকারী বিদ্যাসাগর কোথাও আলাদা নন। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত ছেলেবেলা পার করে স্বচেষ্টায় রাজধানীর বিদ্যায়তনিক সমাজে উচ্চপদে আসীন হওয়ার রাস্তা তাঁর ফুল্লকুসুমিত ছিল না। সমাজসংস্কারকর্মে ব্রতী হয়ে দেখেছেন সমাজই তাঁর সবচে' বড় প্রতিবন্ধক। বাঙালি সমাজকে চোখ দিয়ে চেনেননি তিনি— বুক দিয়ে ছেনেছেন আর সে'কারণেই সমাজের নাড়িস্পন্দনটিকে তিনি সাপের হাঁচির মতো টের পান। রঙিন মানুষ আর তার রংবেরঙের মানসিকতা ও চরিত্র, উত্তাপ ও শৈত্য, নিত্য ও নিমিত্তকে তিনি জীবন দিয়ে মৃত্যু দিয়ে জেনেছেন। সংবেদী পাঠকমাত্রই বুঝবেন *কথামালা* নেহাতই কোনও পশুকথা নয়। মহামতি ঈশপ কাহিনির আড়ালে কাহিনি লিখেছেন, বিদ্যাসাগরও আসলে ভাষান্তর করেছেন কথার এই অন্তরালকথাটিকেই। ফলে সিংহ, বাঘ, শৃগাল, কুকুর, হরিণ, মেষ, মাছি প্রভৃতি জুলজির বিষয় না হয়ে হয়ে উঠেছে প্রতীকবিশেষ।

বাঘ ও বক[৪] গল্পের বাঘটি সমাজের অসাধু শ্রেণির কথা বলেছে, যারা নিজকার্যসিদ্ধির জন্য যা-কিছু পরিকল্পনা করতে পারে। বক দয়াপরবশ হয়ে নাকি বাঘের ঘোষণায় লুব্ধ হয়ে বাঘের মুখে ঠোঁট ঢুকিয়ে ফুটে-যাওয়া হাড়টি বের করে এনেছিল ও বাঘের যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়েছিল সেটা বড় কথা নয়। আদত কথাটি

হল যে অসাধু সে সম্পদে, বিপদে সবসময়ই অসাধু। তার সঙ্গে যে ভালো ব্যবহার করবে তার বকের মতোই প্রতিদান জুটবে। *দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ*[৫] গল্পের দাঁড়কাক আমাদের সমাজের ছদ্মবেশি মানুষদেরকে চেনায়, যারা ছলনায় বড় হতে ও প্রশংসা পেতে চায় কিন্তু শেষমেশ সম্মান হারায়। ময়ূর সুন্দর, ময়ূর নৃত্যকুশলী। এই সৌন্দর্য দেবদত্ত হতে পারে, নৃত্যপ্রতিভা শুধুই দৈবদান হতে পারে না, তাতে আত্মকর্ষণ থাকবেই। দাঁড়কাক ময়ূরপালকে সেজে অহংকারে মত্ত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় ময়ূরের সমাজে তার ঠাঁই হয়নি, কাকেরাও তাকে সমাজচ্যুত করেছে। নির্বোধের অহংপরিণতি এই হয়, এই তো হওয়ার কথা। *সর্প ও কৃষক*[৬] গল্পে বর্ণিত সাপটির মতো মনুষ্যচরিত্র আমাদের আশেপাশে আকছার ঘুরে বেড়াচ্ছে। উপকারীর উপকার স্বীকার না ক'রে তার ক্ষতি করতে চাওয়ার মধ্যে যে ঘৃণ্য কৃতঘ্নতা, তার মধ্যেই কিছু-কিছু মানুষের সন্তোষ নিহিত থাকে। অতএব, কারও উপকার করবার আগে স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনা করবার দরকার। *কুকুর ও প্রতিবিম্ব*[৭] গল্পে কুকুরের প্রতীকে সমাজের লোভী মানুষরা চিত্রিত হয়েছে। নিজের উপায় হওয়ার পরেও পরের উপায়টুকু কেড়ে নিয়ে দ্বিগুণ পেতে চায় যারা, তাদের দশা হয় এ'গল্পের কুকুরের মতো। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট— এও তো পুরনো কথাই। বহুপঠিত *ব্যাঘ্র ও মেষশাবক*[৮] গল্পটি অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাদেরকে দেখায় খলের (কিংবা প্রবলের) ছলের অভাব হয় না। সুতরাং দূরত্ব মেপে চলাই শ্রেয়তর। *মাছি ও মধুর কলসী*[৯] গল্পের রূপকে আমাদের তৃতীয় রিপু ও রিপুকারণে মরণের সেই সুপ্রাচীন প্রবাদটি (লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু)-ই ধ্বনিত হয়েছে। সুখ ক্ষণকালীন, শান্তি চিরন্তন। তবু মানুষ সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না... সুখের মধুতে পা আটকে মাছিমরা মরে। *সিংহ ও ইঁদুর*[১০] গল্প মানুষকে দয়াধর্ম শেখায়, উপকার করার কথা বলে। শ্রেণিগত বিচারে যে সামান্য তার উপকারও কখনও কারও জন্য জীবনদায়ী হতে পারে। শ্রেণির বিচারে সিংহ এগিয়ে থাকলেও ছোট্ট একটা ইঁদুরের হাতে তার প্রাণরক্ষা হল। প্রত্যুপকারের বেলায় সামর্থ্যের চাইতেও বেশি দরকার সদিচ্ছা। *কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল*[১১] গল্পের শৃগাল পরম ধূর্ততার প্রতীকে এসেছে। পরের জন্য পাতা ফাঁদে একদিন নিজেকেও পড়তে হয়— এই শিক্ষা প্রতিটি মানুষের জন্যই জরুরি। আবার এই ধূর্ততাই কখনও-কখনও জীবন চেনায়, প্রাণ বাঁচায়। *শৃগাল ও কৃষক*[১২] ও *পীড়িত সিংহ*[১৩]গল্পের শৃগাল ধূর্ত বলেই মানুষ ও সিংহেরর অভিপ্রায় আগেভাগেই আঁচ করতে পেরেছিল। *ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর*[১৪] গল্পে পালিত কুকুর ও বাঘের কথোপকথনে মধ্য দিয়ে পরাধীনতায় থেকে রাজসুখভোগের চাইতে স্বাধীনতার ক্লেশভোগকেও অধিক আকাঙ্ক্ষার ধন বলে চিহ্নিত করেছেন কথাকার। দেশ তখন ব্রিটিশশাসিত। স্বাধীনতার মন্ত্রই রঙ্গলাল-এর কবিতায় "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,/ কে বাঁচিতে চায়?" বাণী হয়েছিল সেদিন। *কচ্ছপ ও ঈগল পক্ষী*[১৫] গল্পের কচ্ছপের পরিণতি বলে দেয় যা হওয়ার নয় তা হয় না। বরং স্বপ্ন ও সামর্থ্যের মধ্যে সাযুজ্য থাকা দরকার। অহংকার পতনের মূল। এই অহংকারই *হরিণ*[১৬] গল্পের হরিণের মৃত্যুর আর *খরগোস ও কচ্ছপ*[১৭] গল্পের খরগোসের হারের কারণ হয়েছিল। *রাখাল ও ব্যাঘ্র*[১৮] গল্পের মূল প্রতিপাদ্য অসত্যের পরাজয়। মিথ্যের সম্মোহনরূপই একসময় সংহারক হয়ে দাঁড়ায়। *কাক ও জলের কলসী*[১৯] গল্পে কাকের উপস্থিত বুদ্ধি সেই বিখ্যাত প্রবাদটির সাক্ষ্য দেয়— "Necessity is the mother of invention." এই সাক্ষ্য আসলেই শিক্ষা, যা মানুষকে বারংবার দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার করে। *শিকারী কুকুর*[২০], *অশ্ব ও অশ্বপাল*[২১], *পথিকগণ ও বটবৃক্ষ*[২২] গল্পে ফুটে উঠেছে মানবচরিত্রের অকৃতজ্ঞতার দিকটি। *সিংহ, গর্দভ ও শৃগালের শিকার*[২৩] গল্পটিতে রয়েছে পশুরাজ সিংহের অধর্ম ও গর্দভহত্যা এবং শৃগালের চাতুরি অবলম্বন ও স্বীয় প্রাণরক্ষার ঘটনা। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা যখন প্রজার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, রাজা যখন রাজধর্মচ্যুত

হয়, তখন দুর্বল প্রজার পক্ষে ন্যায়ের দাবিও বিপজ্জনক হয়, কৌশলই হয় একমাত্র হাতিয়ার। ছলের বিরুদ্ধে কৌশল করেই জিততে হয়। জেতবার খেলায় কখনও-কখনও পিছিয়েও আসতে হয়। জীবনের এও এক শিক্ষা। *সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার*[১৪] গল্পের কাহিনিরেখাও খানিকটা একইরকম। শুধু এই গল্পে কোনও গর্দভ নেই, শৃগালও নেই। সিংহভাগ বলে যে শব্দবন্ধটি প্রচলিত রয়েছে, তার জন্মকথা এটিতে নিহিত। সবল ও দুর্বলের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না। বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। যে-কোনও অবস্থায় সবলের সঙ্গে দূরত্বরক্ষাই দুর্বলের জন্য কল্যাণকর। *মৃন্ময় ও কাংস্যময় পাত্র*[১৫] গল্পে মৃন্ময় পাত্রটিও এইকথাই বলেছিল। "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ"— এই হল *কৃষক ও সারস*[১৬] গল্পের সারকথাটি। *কুঠার ও জলদেবতা*[১৭] সেই আদি অকৃত্রিম গল্প, শিশুমনে সততার আসন বানাতে যুগে-যুগে মায়েরা যা শুনিয়ে এসেছে। *কৃষক ও কৃষকের পুত্রগণ*[১৮], *গৃহস্থ ও তাঁহার পুত্রগণ*[১৯] গল্পদু'টিতে রয়েছে পুত্রদেরকে দেওয়া পিতার আশ্চর্য ব্যবহারিক শিক্ষা, বলা বাহুল্য যা পিতারও পিতাপুরুষসূত্রেই পাওয়া: ফসলই সোনা, একতাই বল। *দুই পথিক ও ভালুক*[২০], *পথিক ও কুঠার*[২১] গল্প মানুষের নীচতা ও স্বার্থপরতার গল্প মানুষকে শোনায়। বইপড়া বিদ্যাই যে শেষকথা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতাতেই যে ঋদ্ধি— *সারসী ও তাহার শিশু সন্তান*[২২] গল্পটিতে তার প্রমাণ মেলে। *লবণবাহী বলদ*[২৩] গল্প অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়ার প্রচল কথাটিই মনে করিয়ে দেয়। *কৃপণ*[২৪] গল্পে একটি সহজ শিক্ষা রয়েছে যে অতি সঞ্চয় অপচয়েরই অন্য নাম। অর্থকে ভোগ করতে না জানলে তা থাকা আর না থাকার মধ্যে পার্থক্য থাকে না। প্রতিবেশী কৃপণকে সৎ সান্ত্বনাই দিয়েছিল। আবার *পিপীলিকা ও তৃণকীট*[২৫] গল্পে পরিমিত ও প্রয়োজনীয় সঞ্চয়কে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে ধরা হয়েছে। কার্পণ্য মানে সঞ্চয় নয়, ভোগ মানেও অপচয় নয়। দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে জানাই জীবন।

ছুঁয়ে যাওয়া হল না ও ছুঁয়ে যাওয়া হল— *কথামালা*-র সকল ছোট ছোট গল্পগুলিতে এমনই সব নীতিশিক্ষা রয়েছে, যা আজও আমাদের হৃদয়, মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের রসদ জোগায়। নিজের জীবন দিয়ে তিনি (বিদ্যাসাগর) যা জেনেছেন, তা'ই আমাদেরকে জানিয়েছেন। ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত এই মানুষটি ঈশপের ফেবল অনুবাদ না করে অন্য অনেক ইংরেজি গ্রন্থই অনুবাদ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি জানেন নীতি ছাড়া চরিত্র হয় না, চরিত্র গঠন না হলে জাতি গঠন হয় না আর জাতি গঠিত না হলে ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি অবান্তর। এইকারণে *বর্ণপরিচয়* (১৮৫৫ খ্রিঃ)-এর পরে পরেই *কথামালা*-র প্রকাশ (১৮৫৬ খ্রিঃ) ঘটনা হিসেবে লক্ষণীয় বলেই আমাদের মনে হয়। নীতিমার্গ ব্যতীত আর কোনও পালনীয় পথ, আচরণীয় কথা তাঁর জীবনে ছিল না। "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও"— এই প্রবাদটির মূর্তরূপটিই যেন তিনি। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের ৫০ টাকা বেতনের চাকরি অবলীলায় ছেড়েছেন। (দ্র. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: সংক্ষিপ্ত জীবনী, বিদ্যাসাগর রচনাবলী) তেমন হলে বাজারে আলু-পটল বেচবেন ভেবেছেন তবু আত্মসম্মানের সঙ্গে কোনও আপস নয়। 'বিধবাবিবাহ আইন' প্রবর্তনের পর নিজের ছেলে নারায়ণচন্দ্র-র বিধবাবিবাহ দিয়েছেন। হিন্দুর কুল ও কৌলীন্যের রক্ষাকবচ বহুবিবাহ প্রথাকে রদ করতে চেয়েছিলেন আন্তরিকভাবে। আইনি লড়াই করেছেন এ নিয়ে, সই সংগ্রহ করেছেন, লেখালেখি করেছেন। বহুবিবাহ করেছিলেন এবং প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি বয়েসে পৌঁছেও পুনরায় একটি নয় বছরের বালিকার পাণিগ্রহণ করবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন বলে তাঁর ছেলেবেলার মাস্টারমশাই কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে সম্পর্ক অবধি তিনি ছিন্ন করেছিলেন। (দ্র. *সেই সময়*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর স্রষ্টা

শ্রীমধুসূদন দত্ত-র প্রতি ছিল তাঁর অবিরল প্রীতি ও স্নেহ। কতবার কতভাবে যে অর্থসাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা তিনি মধুসূদনকে করেছেন, সে'কথা ভাবলে তাঁর 'দয়ার সাগর' নামের যাথার্থ কিছুটা অনুধাবন করা যাবে। অথচ তাঁর নিজের সমাজই মানুষটিকে দংশন করেছে— কদর্য উপায়ে ব্যবহার করেছে। আইন পাশের পর বিধবাবিবাহকে গণসমাজে চালু করবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন— যদি কোনও হিন্দু তার এ-যাবৎ সমস্ত সংকোচ ও সংস্কার ত্যাগ করে ঘরের বিধবার বিবাহ দেবে মনস্থ করে, তাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অর্থমূল্য উপহার দেবেন। পরে দেখা গেল, ঘরে বিধবা নেই এমন লোকজনও মিথ্যে বিয়ের গল্প ফেঁদে তাঁর থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। একজন, দু'জন নয়— অনেকজন। (দ্র. *সেই সময়*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) মানুষের শঠতার, প্রতারণার অনেক কথাই তো *কথামালা*-য় রয়েছে। স্বয়ং মালাকারই বা তা এড়াতে পারলেন কই? এখানে 'দয়ার সাগর' 'বিদ্যাসাগর'-এর বৈরী হয়েছে। পরিবার-পরিজন ছেড়ে, নাগরিক পরিবেশ ছেড়ে, কর্ম-ধর্ম ছেড়ে, সকল খ্যাতি-অখ্যাতি পিছনে ফেলে কর্মাটাঁড়ের বিজনে শেষজীবন কাটাতে এলেন তিনি। কঠিন শিরদাঁড়ারও তো রোদের প্রয়োজন, আলো প্রয়োজন, শুশ্রূষা ও বিশ্রাম প্রয়োজন। আমাদের জন্য তিনি রেখে গেলেন গার্ডওয়াল। আজকের হত্যা-ধর্ষণময়, আলোকহীন, নীতি ও চৈতন্যশূন্য, রিক্তরুচি, নষ্ট সময়ে (জীবনানন্দ-এর ভাষায় যা 'অদ্ভুত আঁধার') তাঁর *কথামালা* আমাদেরকে আমাদের সময় চিনে নিতে বলে; বিনষ্টি চেনায় কিন্তু আমাদের বিনষ্ট হওয়ার পথে দ্বন্দ্ব ও বিবেকের কাঁটা বিছিয়ে রাখে।

তথ্যসূত্র:

১. *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*, ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, বিংশতি সংস্করণ: জুলাই, ২০১৪, ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পৃ. ২৩৩
২. ঐ, পৃ. ২৩৫
৩. *বিজ্ঞাপন*, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা, কথামালা, বিদ্যাসাগর রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (সম্পা.) সুবোধ চক্রবর্তী, চতুর্থ সংস্করণ: চৈত্র, ১৬১৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, পৃ. ১০৩৩
৪. *বাঘ ও বক*, ঐ, পৃ. ১০৩৪
৫. *দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ*, ঐ
৬. *সর্প ও কৃষক*, ঐ, পৃ. ১০৩৫
৭. *কুকুর ও প্রতিবিম্ব*, ঐ, পৃ. ১০৩৬
৮. *ব্যাঘ্র ও মেষশাবক*, ঐ, পৃ. ১০৩৬-৩৭
৯. *মাছি ও মধুর কলসী*, ঐ, পৃ. ১০৩৭
১০. *সিংহ ও ইঁদুর*, ঐ, পৃ. ১০৩৭
১১. *কুকুর, কুক্কুট ও শৃগাল*, ঐ, পৃ. ১০৩৮
১২. *শৃগাল ও কৃষক*, ঐ, পৃ. ১০৪০-৪১
১৩. *পীড়িত সিংহ*, ঐ, পৃ. ১০৫৬
১৪. *ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর*, ঐ, পৃ. ১০৩৮
১৫. *কচ্ছপ ও ঈগল পক্ষী*, ঐ, পৃ. ১০৩৯-৪০
১৬. *হরিণ*, ঐ, পৃ. ১০৫৯
১৭. *খরগোস ও কচ্ছপ*, ঐ, পৃ. ১০৩৯
১৮. *রাখাল ও ব্যাঘ্র*, ঐ, পৃ. ১০৪০
১৯. *কাক ও জলের কলসী*, ঐ, পৃ. ১০৪১
২০. *শিকারী কুকুর*, ঐ, পৃ. ১০৩৫-৩৬
২১. *অশ্ব ও অশ্বপাল*, ঐ, পৃ. ১০৩৬
২২. *পথিকগণ ও বটবৃক্ষ*, ঐ, পৃ. ১০৪৭

২৩. *সিংহ, গর্দ্দভ ও শৃগালের শিকার*, ঐ, পৃ. ১০৪২
২৪. *সিংহ ও অন্য অন্য জন্তুর শিকার*, ঐ, পৃ. ১০৪৯
২৫. *মৃন্ময় ও কাংস্যময় পাত্র*, ঐ, পৃ. ১০৪৯-৫০
২৬. *কৃষক ও সারস*, ঐ, পৃ. ১০৪৫-৪৬
২৭. *কুঠার ও জলদেবতা*, ঐ, পৃ. ১০৪৮
২৮. *কৃষক ও কৃষকের পুত্রগণ*, ঐ, পৃ. ১০৪৩
২৯. *গৃহস্থ ও তাঁহার পুত্রগণ*, ঐ, পৃ. ১০৪৬
৩০. *দুই পথিক ও ভালুক*, ঐ, পৃ. ১০৪২
৩১. *পথিক ও কুঠার*, ঐ, পৃ. ১০৫৩
৩২. *সারসী ও তাহার শিশু সন্তান*, ঐ, পৃ. ১০৫১-৫২
৩৩. *লবণবাহী বলদ*, ঐ, পৃ. ১০৫৯
৩৪. *কৃপণ*, ঐ, পৃ. ১০৫৫
৩৫. *পিপীলিকা ও তৃণকীট*, ঐ, পৃ. ১০৬৮

গ্রন্থপঞ্জি

১. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), (সম্পা.) সুবোধ চক্রবর্তী, চতুর্থ সংস্করণ: চৈত্র, ১৬১৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, সেই সময়, ষষ্ঠদশ মুদ্রণ- জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯
৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, বিংশতি সংস্করণ- জুলাই ২০১৪, ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯